http://www.elearninginfo.in

পথের কাঁটা

রমেশচন্দ্র সেন

'আর কতটা পথ, বাবা ?' যাদবের কণ্ঠে কাতর প্রশ্ন। স্বর পাখির ছানার চিঁচিঁ-র মতন করুণ।

এগারো-বারো বছরের ছেলে, শ্যামবর্ণ, সরু-সরু হাত পা। পেটটা বড়ো। চোখ কটা। হাঁটিয়া-হাঁটিয়া পা ভারি হইয়াছে, আর পারে না ; কিছুটা পথ চলিয়াই নিশ্বাস নেওয়ার জন্য দাঁড়ায়। বাপ অমনি ধমক দেয়, 'এই হারামজাদা হইছে পথের কাঁটা। চল, চল।'

যাদবের মা বলে, 'রোগা ছাওয়ালরে অত ধমকাও ক্যান ? তুমি যখন ছিলা না, ওই ত আমাগো রক্ষা করছে।'

'রক্ষা করছে না হাতি', যাদবের বাপ পরাশর রাগে গশগশ করে। শক্তিমান পুরুষ, শ্যামবর্ণ, দেখিতে সুশ্রী—বয়স ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, কিন্তু এই কয়দিনের দুর্দৈবে, অনাহার ও অনিদ্রায় তার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। একহাতে টিনের তোরঙ্গ, পিঠে বোঁচকা, আরেক হাতে যাদব। এইভাবে চলিতে তার কষ্ট হয়। সে এক-এক বার বলে, 'কী পাপই যে করেছিলাম। শেষটায় দেশছাড়া, ভিটাছাড়া হইলাম।'

তার স্ত্রী মোহিনী বলিল, 'পাপ-পুণ্য বইলা কিছু নাই। সেদিন গাঙ্গুলি ঠাকুররে খাওয়াইলাম, বামুন ভোজনের ফল ত হইল এই।'

তার গায়ের রং কালো, দাঁতের উপরের পাটি ও কপাল উঁচু। চোখ দুটো বড়ো। বয়স অনুমান করা যায় না—তবে দেখিতে স্বামীর চেয়ে বড়ো দেখায়।

তার বাঁ হাতে বোঁচকা, ডান হাতে ভাঙা বালতির ভিতর ময়লা জীর্ণ একটা লণ্ঠন, নুনের মালা, তেলের শিশি, দু-একটা ঘটি-বাটি, গরিব সংসারের সামান্য তৈজসপত্র।

চলিয়াছে কাতারে-কাতারে-মানুষ—পঙ্গু, অন্ধ, খঞ্জ, সুস্থ; বলবান, যুবা, শিশু, বৃদ্ধ, নর ও নারী। পুব হইতে পশ্চিমে বাক্স-পেঁটরা হাঁড়ি-কুড়ি বিছানার যোজনব্যাপী বিরাট কিন্তু বিচ্ছিন্ন মিছিল। কোনো দল আগে গিয়াছে, কাহারাও-বা পিছনে আসিতেছে। মানুষগুলার চোখে-মুখে অদ্ভুত ভীতি, সামান্য শব্দেই আঁৎকাইয়া ওঠে। মাঝে-মাঝে পিছু তাকায়। দূরে অস্পষ্ট কিছু দেখিলেই বলে, 'ঐ—ঐ—'

শুধু রুগ্ন যাদবের নয়, সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, 'পথ আর কতটা ? পশ্চিম বাঙলা কত দূর ?'

বৃদ্ধরা অশক্তরা এক-একবার পথের উপরই বসিয়া পড়ে। সঙ্গীরা ভয় দেখায়, 'ঐ ঐ আনসার !'

ভয়ত্রস্ত মানুষগুলো আবার চলে।

আজ কয়দিন যাবৎ একই দৃশ্য। দলে-দলে মানুষ পুব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে।

দলে-দলে আসিতেছে পশ্চিম হইতে পুবে।

কিছুটা পথ যাইয়াই যাদব আবার বসিয়া পড়ে।

'তর জন্য মরুম না কি হারামজাদা ?' বলিয়া পরাশর ছেলেকে রুখিয়া গেল।

মোহিনী বলিল, 'তুমি কি পাগল হইলা নাকি ?'

'হইছি ত, পাগল করছে বাবুরা। দেশ ভাগ লইয়া তারা যখন মাইতা উঠছিল ও তখন নিশান লইয়া তাগো পিছু-পিছু ছোটছে। তখন মানা করি নাই ?'

'ও কি বুইঝা চ্যাচাইছে, না বাবুরাই তখন বুঝছিল ?'

'বোঝে নাই ক্যান ? যত-সব আহাম্মক !'

এই সময় পিছন হইতে আরেকটি দল আসিয়া তাদের সহিত মিলিত হইল। সকলের আগে বিশ-বাইশ বছরের এক তরুণ, তার পিছনে দুইটি তরুণী। তিন জনের মুখের আদল একই রকম, দেখিলে মনে হয় ভাই-বোন। তার পর তাদের বাপ-মা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। বাপের হাত ধরা পাঁচ বছরের একটি ছেলে পরাশরের উদ্দেশে বলিল, 'থিঃ লাগে না।' (ছিঃ রাগে না)।

পরাশর হাসিয়া ফেলিল।

ধমক খাইয়া যাদব তখনও কাঁদিতেছিল। মোহিনী তার গায়ে হাত দিয়া বলিল, 'অ্যাঁ, গা-গতর একেবারে পুইড়া যাইতাছে।'

পরাশর বলিল, 'যাউক, পুইড়া ছাই হইয়া যাউক। আঙার।'

মোহিনী মনে-মনে ঠাকুরকে ডাকে, 'ওইকথা শুইনো না ঠাকুর। আমি তোমারে সিন্নি দেবো। কলফাতায় যাইয়া দুধ-কলার সিন্নি।'

যাদব জল চায়। তার মা প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কাছে জল আছে ?'

প্রৌঢ়া বলিল, 'জল নাই, দুধ আছে। দেবো ?'

'দেন, ভালই হবে। দুধে শক্তি হয়।'

দু-তিন ঢোঁক দুধ গিলিয়াই যাদবের পিপাসা বাড়িয়া যায়। সে জল-জল বলিয়া কান্না শুরু করে।

পরাশর বলে, 'এই ছাওয়ালই হইছে আমার পথের কাঁটা। মরতে হবে অর জন্য। কখন আনসাররা আইসা পড়ে।'

আনসার শুনিয়া তরুণী দুটির মুখ শুকাইয়া যায়। তারা এদিক-ওদিক তাকায় ; তাদের ছোটো ভাইটি কিন্তু 'আনথাল' বলিয়া হাসিয়া ওঠে।

পরাশর বলে, 'হাইসো না, খোকা। আনসার হাসির জিনিস না।'

যুবকটি তাকে বলিল, 'চলেন, আমরা আউগাইয়া যাই। জল নিশ্চয়ই মেলবে। আপনার ছাওয়ালরে আমরা ভাগাভাগি কইরা নেব খন।'

আবার পথ চলা শুরু হয়। যুবকটির কাঁধের উপরে যাদব, পিছনে তার দুটি বোন, তার পরে তাদের বাপ-মা—প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া ; প্রৌঢ়ের হাত ধরা তার ছোট্ট ছেলে। সকলের পশ্চাতে মোহিনী ও পরাশর।

তরুণীদের একজনের হাতে টিনের সুটকেশ, অপরটির হাতে বোঁচকা ; তাদের মা মোটা মানুষ, চলিতে কষ্ট হয়, তার হাতে বেশি-কোনো জিনিশ নাই, শুধু একটা পুঁটলিতে কয়েকখানি কাঁথা-কাপড়।

রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠের শেষ প্রান্তে দেখা যায় গাছের সারি। হলুদরঙা শাড়ির প্রান্তে যেন স্নিগ্ধ সবুজ একটা পাড়। মোহিনীর মনে পড়ে নিজের গ্রাম সারাতলির কথা। সেখানে নিজেদের সবুজ বাগান ছিল, ছিল টিনের ঘর, ধানের গোলা, হাল, গোরু, লাঙল। বাগানে আম লেবু তাল নারিকেলের সারি, নিচে ছোট্ট খাল। খাল যেমন ছোটো-ছোটো ঢেউ বুকে করিয়া চলে, ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাদের জীবনও তেমনি চলিত।

সেই গ্রাম ছাড়িয়া আসিতে হইল।

তার আগে মোহিনী ও যাদব তিনদিন জঙ্গলে লুকাইয়া ছিল। পরাশর বাড়ি ছিল না। ছেলের হাত ধরিয়া মোহিনী পশুর মতন এ-জঙ্গল হইতে ও-জঙ্গলে লুকাইয়াছে।

মাঝে-মাঝে চিৎকার শোনা যাইত, 'গেলাম রে গেলাম,মরলাম। রক্ষা করো, রক্ষা করো।'

সবচেয়ে করুণ রূপী নাপতানির আর্তনাদ। মানুষ-পশুর হাতে লাঞ্ছিতা মেয়েটির সেই কাৎরানি মোহিনী কখনও ভুলিতে পারিবে না। ভোলা অসম্ভব।

একদিকে কাৎরানি, আরেকদিকে হিংস্র উল্লাস।

আকাশ এক-একবার লাল হইয়া যায়। ওঠে আগুনের বড়ো-বড়ো গোলা, মনে হয় শয়তান যেন আগুন লইয়া ফুটবল খেলিতেছে।

তিন-তিনটা দিন সে কী নরকযন্ত্রণা ! সেই জঙ্গলেই যাদবের জ্বর হয়, ম্যালেরিয়া। তিনদিন পরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সেরাজুল হক তাদের রক্ষা করেন। কার্যোপলক্ষে তিনি বিদেশে গিয়াছিলেন। গ্রামে ফিরিয়া মহকুমা হাকিমের নিকট লোক পাঠাইয়া সশস্ত্র পুলিশ আনাইলেন। হিন্দুদের বাড়ি-বাড়ি খোঁজ করা হইল, জঙ্গলে-জঙ্গলে নিজে গিয়া ডাকিলেন, 'কে লুকাইয়া আছে ? বাইর হইয়া আইস, ভয় নাই।'

তাঁর কথা শুনিয়া ভীত মানুষগুলা বাহির হইয়া আসে। তাদের মূর্তি দেখিয়া তিনি ভয় পান, এ কী ! তিন দিনে মানুষ এমন করিয়া বদলায় ? তাদের তিনি মহকুমায় পাঠাইয়া দেন। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে পরাশরের দেখা হয় সেইখানে।

কয়লার অভাবে স্টীমার বন্ধ। মহকুমা হইতে তারা রওনা হয় হাঁটা পথে। তাদের দলে এক সারাতলি গ্রামেরই ছিল সাত-সাতটা পরিবার !

পথে খাল-বিল অনেক, দুইটা বড়ো নদী। রাস্তার খেয়াঘাটে স্বেচ্ছাসেবীরা, আনসাররা ধরিল, 'গহনা নিয়া চললা কোথায় ?'

'পাকিস্তানের সোনা-রূপা চুরি কইরা পালাইবা ভাবছ ?'

'মাথা প্রতি দশ টাকার বেশি নিতে দেবো না। বাড়তি টাকা থুইয়া যাও।'

একে-একে অনেক জিনিসই ছাড়িয়া আসিতে হইল। কারও সঙ্গে রহিল শুধু পরনের কাপড়। যাদবের অসুস্থতার জন্য পরাশররা পিছনে পড়িয়া গেল। তারা যখন রেলস্টেশনে

আসিয়া পৌঁছিল তখন হাতে ট্রেনের মাশুল দেওয়ার মতন পয়সাও ছিল না।

পথে একদল আনসার ধরিল, 'এ কী, করাত কেন ? করাত ছেনি বার্তুল, এ-সব নিতে পারবা না ?'

পরাশর বলিল, 'এ আমার রোজগারের হাতিয়ার। এই দিয়া ছাওয়াল বউরে খাওয়াইয়া রাখি ! দোহাই আপনাগো, এগুলা রাখবেন না।'

তার আবেদনে কোনো ফল হইল না। তবে একটা জিনিস রক্ষা পাইল—শুধু ছোট্ট একখানা শৌখিন করাত। কালো কুচ্‌কুচে হাতল, মনে হয় মেহগনির তৈরি।

পরাশর একজন ভালো মিস্ত্রি। শুধু অন্নের জন্যই সে কাজ করে না, করে শিল্পসৃষ্টির আনন্দে। তাদের আশেপাশে অনেক গ্রামে তার হাতের সুন্দর বহু কাজ আছে। সেরাজুল হকের বাড়িতে কাঠের মস্ত বড়ো একটা মূর্তি তার অন্যতম। দেখিলে মনে হয় জীবন্ত কোনো মানুষ উবু হইয়া পায়ের কাঁটা তুলিতেছে।

হক সাহেব খুশি হইয়া নিজের নামাঙ্কিত এই করাতখানি উপহার দেন আর দেন একখানি প্রশংসাপত্র।

জিনিসটা কোনো কাজে লাগিবে না বলিয়াই হয়তো আনসাররা ছোট্ট এই করাতখানি তাকে ফিরাইয়া দিল।

বেলা বাড়ে। পথের ধারে আগে তবু দু-চারটা গাছ ছিল, এখন তাহাও নাই। এ যেন ধূসর মরু, রোদ গায়ে ছুঁচের মতন বেঁধে, পায়ে বেঁধে রোদেপোড়া ঘাসের ডগা। পথ ধুলায় ঢাকা, কোথায়ও যাত্রীদের গোড়ালি পর্যন্ত ধুলায় ডুবিয়া যায়। বাস্তুহারাদের পিছু-পিছু চলে ধুলির ওড়না, তাতে সূর্যও যেন ঢাকা পড়ে। মলিন দেখায়। ধুলায় যাদবের গলা আটকাইয়া আসে, সে কাশে খুকখুক করিয়া।

তবে তাদের নূতন প্রৌঢ় সঙ্গীটি পথের কষ্টকে অনেকটা হালকা করিয়া দিল। বলিল, 'এ আর এমনকী কেলেশ ? এর চাইয়াও অনেক বেশি বিপদে পড়ছি।'

পরাশর বলে, 'এর থাও বিপদ ! এ আপনি কন কী ?'

'হ মশয়,' প্রৌঢ় বিপদের কয়েকটি গল্প করে, সবই তার নিজের জীবন-কাহিনী। গল্পগুলি রোমাঞ্চকর, দিনের বেলায়ও গায়ে কাঁটা দেয়। মনে হয় মিথ্যা, তবু শ্রোতারা অবাক হইয়া শোনে।

এর পর সে দেয় নিজের পরিচয়। নাম তার পতিতপাবন। লোকে ডাকে ঘাতক বলিয়া। এককোপে সে বড়ো-বড়ো মহিষ কাটিতে পারে, তাই এই নামকরণ হইয়াছে।

লোকটি তাদের নিজের দেশের কথা বলে। তাদের দেশ কাছেই, এখান হইতে বিশ-পঁচিশ মাইল দূর। সেখানে কোনো উপদ্রব হয় নাই। হিন্দু মুসলমানরা এখনও সদ্ভাবে পাশাপাশি বাস করে। তবে ভদ্রলোকরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। দেখাদেখি চাষি-মজুররাও যাইতেছে। তার বাড়ির সিকি মাইলের মধ্যে কোনো লোক নাই ; স্বজাতি এমন একজনও নাই যে মরার সময় মুখে এক ফোঁটা জল দেয়, মরার পর দেহ কাঁধে করে। দেশে

থাকিবে কীসের ভরসায় ? কার উপর নির্ভর করিয়া ? তাই দেশ ছাড়িয়া চলিয়াছে।

সঙ্গে টাকা-কড়িও কিছু আছে, জমি কেনার মতন কিছু টাকা আর কলসিতে বীজ ধান। হিন্দুস্থানে পৌঁছিয়াই সে ধানের জমি কিনিবে, চাষ করিবে।

টাকার কথা বলায় তার স্ত্রী গলা খাঁকারি দিল। ঘাতক বলিল, 'কাশো ক্যান ? আমি লোক চিনি। এনারে বিশ্বাস করা যায়। ইনি অতি মহাশয় লোক।' তার পরই পরাশরকে বলে, 'ইনি আমার গেরিনি কুমুদিনী, লোকে ডাকে কুমুদ। আমার বাপ আর অর জ্যাঠা ছিল মিতা। লোকে কয়, আমি অরে পছন্দ কইরা বিয়া করছি।'

আর কুমুদ কয়, 'আমারে দেইখ্যা অর পছন্দ হইছিল। হইতেও পারে। এগারো-বারো বছরের মাইয়ার মনে হয়তো একটু কাঁচা রং ধরছিল'—বলিয়াই হাসে—ভারি প্রাণখোলা হাসি।

আবার শুরু করে, 'আমার ছোটো-ছাওয়ালটির নাম হাম্বীর—ভারি বুদ্ধিমন্ত। পাঁচজনে কয়, বাপকা বেটা। মাইয়া দুইটি ছায়া আর কায়া। রোগাটি কায়া আর স্থূলটি হইল ছায়া। ছায়া মায়ের মতন।'

ছায়া লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া পড়ে। কুমুদিনী স্বামীর উদ্দেশে আরো জোরে গলা খাঁকারি দেয়।

ঘাতক বলে, 'বড়ো ছাওয়াল পেরতাপ মায়ের মতন হইলে আরো ভালো হইত। ফুলা গাল, তার মধ্যে চোখ য্যান বইসা গেছে।'

প্রতাপ বলে, 'তুমি থামো, বাবা।'

এই সময় দূরে রেখা যায়, কালো একটা রেখা। ঘাতক ঐদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাদবও চোখ মেলে। কিন্তু তার চোখ ছিল পুব দিকে, রেখাটা পশ্চিমে। সে ধুলায় ঢাকা আকাশ ছাড়া কিছুই দেখিতে পায় না।

একটুক্ষণ চাহিয়া পরাশর বলে, 'একদল মানুষ নাকি ?'

ছায়া বলিল, 'যদি মোছলমান হয় ?'

'মোছলমান ?' কুমুদিনীর গলায় ধুলা আটকাইয়া গেল। মোহিনী চোখ বুজিয়া ঠাকুরের নাম আওড়াইল।

পরাশর বলিয়া উঠিল, 'দেশ ভাগ করছে ! যত সব—'

কালো রেখা স্পষ্ট হয়, আরো বড়ো হয়। দেখা যায় সত্য-সত্যই একদল মানুষ আসিতেছে।

ধ্বনি ওঠে, 'আল্লা হো—'

নির্মেঘ আকাশে বজ্রনির্ঘোষ হইলেও পরাশররা এতটা আঁৎকাইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। প্রতাপ ছাড়া সকলেরই মুখ কালো হইয়া গেল। ছায়া ও কায়া সমস্বরে ডাকিল, 'বাবা !'

'আল্লা হো, আল্লা—' আওয়াজ ক্রমেই জোরে হয়।

প্রতাপও পাল্টা আওয়াজ করে, 'বন্দে—'

হাম্বীর হাসিয়া বলে, 'আনথাল—'

পরাশর বলে, 'এই কি হাসির সময়, খোকা ?'

ঘাতক বলে, 'হাসিস ক্যান রে হাম্বীর ?'

সমাজের এই আলোড়ন ও বিপ্লব, বড়োদের ভীতি হাম্বীরের শিশু মনে শুধু হাসিরই খোরাক জোগায়। সে আবার হাসিয়া বলে, 'আনথাল।'

মুসলমানদের দলে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েই বেশি, আর বোরকাপরা কয়েকটি স্ত্রীলোকে। পুরুষ ছিল দশ-বারোটি।

প্রতাপ বলিল, 'মাইয়া লোক আর কচি-কাঁচা লইয়া কেউ লড়তে আসে না। তোমাদের কোনো ভয় নাই, মা।'

ঘাতক বলিল, 'অরাও হয়তো ঘরবাড়ি ছাইড়া পুব দিকে যাইতাছে।'

পরাশর বলিল, 'গুনতিতে অরা বেশি। যদি প্রতিশোধ নেয় ?'

প্রতাপ বলিল, 'ঐ কয়জনারে আমি আর বাবাই কিছুক্ষণ রোখতে পারব—কী কও, বাবা ?'

ঘাতক বাহুর গুলি ফুলাইয়া বলে, 'তা পারুম, গতরে সে-জোর এখনও আছে।'

তাদের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় আর একদল হতভাগ্য মানুষ, চোখে সমান হতাশা, চেহারায় একই রূপ রিক্ততার ছাপ। পুরুষের কাঁধে গাঁটরি-বোঁচকা, বগলে বিছানা, নারীর কোলে শিশু, হাতে বদনা। এরাও ঘর-বাড়ি হারাইয়াছে, সর্বস্ব খোয়াইয়াছে। কারো বাপ মরিয়াছে, কারো ভাই, কারো স্ত্রী। মায়ের চোখের সামনে দুর্বৃত্তরা ছেলেকে মারিয়াছে।

দূর হইতে মানুষ দেখিয়া তারাও ভয়ে আওয়াজ করিয়াছিল, 'আল্লা হো—'

মাথায় ফেট্টি-বাঁধা একটি যুবককে দেখিয়া মোহিনীর মনে পড়িল তার জ্ঞাতি দেবর জুয়ানের কথা। তার মাথায়ও ছিল ঐ রকম ফেট্টি। মহকুমায় আসিয়া ছেলেটি ধনুষ্টঙ্কারে মরিয়া গেল।

সামনে আসিয়া একদল আরেক দলের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দু-দলের দৃষ্টিই শান্ত, স্থির, তাতে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই। তাদের চোখে শুধু একটি প্রশ্ন, 'তোমাদেরও এই দশা ভাই ? এ করল কে ? কারা ?'

প্রশ্নের সঙ্গে ছিল সহানুভূতি, মানুষে-মানুষে দরদ। বোরকার আড়াল হইতে নারীর মৌন চাহনিতেও সেই সহানুভূতি ফুটিয়া বাহির হইল।

উভয় দলই আবার চলিতে আরম্ভ করে, চলে বিপরীত দিকে। এবার কেহ আর আল্লা হো আকবর বলিয়া আওয়াজ করে না, বন্দে মাতরম্‌ও নয়। তাদের সহানুভূতি ধ্বনির জগৎ ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

একটু পরে মোহিনী বলিল, 'অদের কাছে জল আছে কিনা দেখলে হইত।'

ঘাতক বলিল, 'মাইয়াদের বুদ্ধিই ঐ রকম। সাধে কি কইছে পথে নারী বিবর্জিতা।'

আরো খানিকটা পথের পর রাস্তার পাশেই ছায়া-আশ্রয় মিলিল। টলটলে জলে-ভরা বড়ো একটা দিঘি ; চার পারে শাল, শিমূল, অশোক, অর্জুন গাছ। পুব পারে ধ্যানমগ্ন মুনির

মতন জটাজুটলম্বিত এক বট।

চার পারে মানুষের অসম্ভব ভিড়। পুব দিকে অপেক্ষাকৃত কিছু কম। অনেকে স্নান করিতেছে। যুবারা সাঁতার কাটে ; তাদের পায়ের আঘাতে জলের উপর যেন কতকগুলি শাদা ফুলের তোড়া ফুটিয়া ওঠে।

মেয়েরাও জলে নামিয়াছে, তারা পারের কাছে দাঁড়াইয়া কুলকুচা করে, মুখ ধোয়, গা মাজে।

ছোটো-ছোটো কতকগুলি চুল্লির উপর হাঁড়ি কড়াইয়ে চাল-ডাল সিদ্ধ হয়। পাশেই কেহ ভাত খায়, কেহ চিঁড়ামুড়ি। আরেকদল শুধু খাওয়া দ্যাখে, জিভ দিয়া ঠোঁটের দুই কোণ চাটে।

ছেলেকে ছায়ায় শোয়াইবার জন্য মোহিনী জায়গা খোঁজে। চলে অতি সন্তর্পণে, হাঁড়ি-কুড়ি বাক্স-পেঁটরা এড়াইয়া। কিন্তু কথাটা কারো কাছে তুলিতে ভরসা করে না।

শেষটায় সুন্দরী এক তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার রোগা ছাওয়ালটার জন্য একটু জায়গা হবে ? আজ কয়দিন অর জ্বর।'

তরুণী বলিল, 'জায়গা ত আমার কেনা না। কিন্তু এখানে কি বসবেন ? আমার ছাওয়ালের ঘন-ঘন দাস্ত হইতাছে।'

মোহিনী বলিল, 'না, না—তা হইলে থাউক।'

শেষটায় আশ্রয় দিল এক বৈষ্ণবী। শ্যামবর্ণ, টিকলো নাক, গলায় তুলসীর মালা, নাকে রসকলি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গঠন ঋজু ও সুঠাম। সে নিজে রৌদ্রে সরিয়া বসিয়া গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় যাদবকে শোয়াইয়া দিল। কমণ্ডলু হইতে জল ঢালিয়া খাওয়াইল। যাদব দুই-এক ঢোঁক খাইয়াই মুখ ঘুরাইয়া নিল।

বৈষ্ণবী বলিল, 'জল ফুটাইয়া নিছি। তাই একটু গন্ধ আসে।'

একটু পরে যাদব ঘুমাইয়া পড়িল।

বৈষ্ণবী বলিল, 'তোমাদের দেশে কি অত্যাহিত কিছু ঘটছে ?'

মোহিনী তাদের গ্রামের হত্যা ও অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা দিয়া বলিল, 'আপনাগো গাঁয়ে ?'

বৈষ্ণবী উত্তর করে, 'আমার গাঁ বইলা কিছু নাই। আমার রাধাবল্লভরে নিয়া নবদ্বীপ চললাম।'

'এখানে নাকি পেটের পীড়া হইতাছে ?'

'সোজা পেটের পীড়া না, একেবারে বিসূচী।'

'কলোরে !'

কলেরা কথাটা কেউ মুখে আনে না। কয় দাস্ত হইতেছে।

'মরছে কেউ ?'

'আমি কাউলকা আইছি, তারপর দুইজন মরছে।'

মোহিনী বলিল, 'এখন কী করি কন দেখি ? রোগা ছাওয়ালরে রোদ্দুরে নিয়া গেলে মাথায় রক্ত উইঠা মরবো। এইখানেই বা থাকি কী কইরা ?'

'ভয় নাই। রাধাবল্লভ অরে বাঁচাবেন।'

বৈষ্ণবীর কাছে ছেলেকে রাখিয়া মোহিনী স্নান করিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুমুদ দুখানা ইঁট দিয়া উনান বানাইয়া তার উপর হাঁড়ি চড়াইয়াছে।

সে মোহিনীকে বলিল, 'তোমাগো দুজনের চাউলও চড়াইয়া দেই ? তুমি ছাওয়াল নিয়া থাকো।'

মোহিনী বলে, 'দরকার নাই। চারটি চিঁড়া আছে।'

'চাউলের জন্য ভাইবো না। বাড়তি চাউল আমাগো আছে। আজ দুইদিন তোমরা ভাত খাও নাই।'

মোহিনী ইতস্তত করে। স্বামীর দিকে তাকায়। সে বলে, 'আমরা বাঘা ক্ষেত্রি। আপনারা কী জাত ?'

ঘাতক বলিল, 'আমরা তেঁতুলে বিছা।'.

'সে কী ! তেঁতুলে বিছা ত শুনি নাই !'

'আপনাদের পালটা ঘর। আমাদের ছোঁয়া আপনারা খাইতে পারেন।'

পরাশর বলে, 'পরিহাস করলেন বুঝি ?'

প্রতাপ ধমক দেয়া উঠিল, 'তুমি চুপ করো, বাবা। এখনও জাত আর জাত। আমাগো লজ্জা আর হবে কবে ?'

ফুটন্ত ভাতের গন্ধ বাহির হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চারধারে ছোটো-ছোটো অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আসিয়া জড়ো হয়। কেহ উলঙ্গ, কেহ নেংটি পরা, গায়ে ময়লা, চোখ বসিয়া গিয়াছে। তারা হাঁড়ির ভিতরের শাদা জলের দিকে তাকায়। ক্ষুধায় কারো কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, কারো চোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়।

কুমুদিনী একটা থালায় ভাত ঢালিলে বুভুক্ষুর দল তার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। সে বলিল, 'আমার সোয়ামি আর ছাওয়ালরে আগে খাওয়াইয়া লই। তারপর তোমরা পাবা। এখন একটু সইরা যাও দেখি।'

কেহ-কেহ অনিচ্ছায় দু-চার পা পিছাইয়া যায় বটে কিন্তু কে আগে পিছাইবে ইহা লইয়াও নিজেরা ধাক্কাধাক্কি করে। কুমুদিনী ধমকায়, 'এ-রকম করলে একটা কণাও দিমু না।'

গরম ভাতে হাত দিয়া হাম্বীর আঙুল পোড়াইয়া ফেলিল। কুমুদিনী ধৈর্য হারাইয়া বুভুক্ষু ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'তোরা দিষ্টি না-দিলে হামুর হাত পোড়ত না। যা মড়ারা, দূর হ।'

একজনের মা কাছেই ছিল। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'ক্যান রে, পোড়ামুখি লক্ষ্মীছাড়া ? একমুঠা চাউলের এত দেমাক ! চাউল কি আমরা দেখি নাই ? অমন কত চাউল হাঁসরে কাউয়ারে খাওয়াইছি।'

কুমুদিনীর আর খাওয়া হয় না। সে গ্রাস দুই-তিন ভাত মুখে তুলিয়াছে, এই সময় বুভুক্ষুরা আবার তাকে ঘিরিয়া ধরে। সে নিজের খাবার বিলাইয়া দেয়। সময় কাটে। সন্ধ্যার

একটু আগে দিঘির ওপারে ওঠে কান্নার রোল, 'তরে শেষে এইখানে ছাইড়া গেলাম,এই মড়ার দিঘিতে ?'

পরাশর ঘাতককে জিজ্ঞাসা করিল, 'আরেকজন গেল বুঝি ?'

ঘাতক ইতিমধ্যেই দু-তিনবার দিঘির চার পাশ ঘুরিয়া আসিয়াছে। অনেকের সঙ্গে আলাপ জমাইয়াছে। সে বলিল, 'হ, আমরা আসার আগেও নাকি গেছে।'

পরাশর বলিল, 'এ কন কী ?'

ঘাতক বলিল, 'রোজই দুই-একজন মরে। ফ্যালে পুবদিকের মাঠে, দিঘির নিচে। আমি হাড়গোড় দেখছি। যাবেন নাকি দেখতে ?'

পরাশর বলিল, 'রক্ষা করেন।'

সন্ধ্যার আঁধার নামে। চারদিকের আর-কিছুই দেখা যায় না, এমনকী পাশের লোককেও নয়, এ যেন ব্ল্যাকআউটের রাত। লোকে ভয়ে আলো জ্বালে না। বিড়িখোরেরা হাতের তেলোয় আড়াল করিয়া বিড়ি ধরায়। বিশেষ প্রয়োজনে আলো জ্বালিতে হইলে তার উপর ঠুলি পরাইয়া লয়।

আঁধার-গম্ভীর এই পারিপার্শ্বিকের মাঝে গেরুয়া রঙের থলের ভিতর হইতে একতারা বাহির করিয়া বৈষ্ণবী গান ধরে,

'একতারা তোর বাজা—
আসবে সোনার রথে চড়ি
তোর হৃদয়ে রাজা।
নাই-বা থাকল শঙ্খ-ঘণ্টা
নাই বা মালসাভোগ—
হিশাবনিকাশ কীসের ওরে,
কীসের দুঃখশোক ?'

চমৎকার কণ্ঠ। তরুণীর কণ্ঠের মতন কোমল অথচ চড়া, একতারার বোলের মতন মিষ্টি। গান আঁধারের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করে, বাতাস মূর্ছনায় ভরিয়া যায়।

সে থামিলে একটি তরুণী আসিয়া বলিল, 'আরেকখানা গাও দিদি। আমার ছাওয়াল শোনতে চায়।'

মোহিনী এই মেয়েটির কাছেই আশ্রয় চাহিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার ছাওয়াল আছে কেমন ?'

তরুণী বলিল, 'ভাল না। সে ওনার গান শোনতে চায়।'

বৈষ্ণবী আবার ধরে,

'আমার গৌরী হবেন রাধা
তার সুরেতে এ-বীণ আমার
থাকবে সদাই সাধা।'

শেষরাতে মোহিনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ভোরে উঠিয়া দেখে, বৈষ্ণবী যাদবের শিয়রে

বসিয়া গুনগুন করিতেছে।

পাশে কুমুদিনীদের জায়গাটা ফাঁকা। সেখানে কতকগুলি ভিজা চিঁড়া পড়িয়া আছে। এক চড়ুই দম্পতি খুঁটিয়া-খুঁটিয়া উহা খায়। একটু দূরে সারি বাঁধিয়া পিঁপড়ারা চিঁড়া মুখে করিয়া বাসার দিকে চলে। কুমুদিনীদের জন্য মোহিনীর দুঃখ করে, বিশেষ করিয়া হাম্বীরের জন্য।

স্নানান্তে বৈষ্ণবী জল লইয়া ফিরিল। সেই জলে রাধাবল্লভকে স্নান করাইয়া তাঁর পূজা করিল। ঠাকুরকে পিতলের কৌটার ভিতর মখমলের তোষকে শোয়াইবার সময় বলিল, 'ঠাকুর, ছাওয়ালটারে সারাইয়া তোলো।'

পরাশর উঠিল বেলা করিয়া। দিঘির পাড়টা তখন আরো ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'পেরতাপ, ঘাতকদা, এরা গেল কোথায় ?'

মোহিনী বলিল, 'আমি ওঠার আগেই তারা চইলা গেছে।'

পরাশর বলে, 'গেছে ত দেখতাছি সবাই। খালি আমাগো কপালেই যাওয়া হবে না।'

বৈষ্ণবী বলিল, 'সবই রাধাবল্লভের লীলা।'

পরাশর বলিল, 'থুইয়া দেন আপনার লীলা। ভারি খ্যামতার গোঁসাই তিনি।'

বৈষ্ণবী ধীরে-ধীরে রাধাবল্লভের নাম আওড়ায়।

সারাদিনে আসিল মাত্র দুইটি নূতন দল। পরাশর বলিল, 'পাকিস্তান শেতল হইয়া গেল নাকি ?'

যাদবের অবস্থা একইরকম। আগের দিন কুমুদিনী বার্লি দিয়াছিল। আজ বার্লি নাই, যাত্রীদের কাছে চাহিয়া সাবু, বার্লি, এমনকী একটু চিনিও পাওয়া গেল না। মিলিল শুধু মুড়ি।

জলে-ভিজানো সেই মুড়ি খাইতেও যাদবের কষ্ট হয়। কণ্ঠনালীতে আটকাইয়া যায়। পরাশর হাল ছাড়িয়া দেয়। ভিজা মুড়ি গিলিতে যার কষ্ট হয়, হাঁটার কষ্ট সে সহ্য করিবে কেমন করিয়া ?

পরদিন আরো তিন-চারটি দল চলিয়া গেল। নতুন একটিও আসিল না। জায়গাটা ফাঁকা হইয়া গেল। যাদব চাহিল বৈষ্ণবীর গান শুনিতে—'গাও না গৌরীর গানটা।'

বৈষ্ণবী শুনাইল—

'গৌরী হবেন রাধা...'

বার-বার গাহিল।

পরাশর বৈকালের দিকে ঘুরিতে-ঘুরিতে দিঘির পুবপাড়ে আসে। চারটা পাড়ের মধ্যে এইটাই সুন্দর। দেবদারু অশোক পলাশের ছাওয়ায় ঘেরা, মাঝে-মাঝে ছোটো ঝোপ।

হঠাৎ পুবের মাঠের দিকে চোখ পড়ায় দ্যাখে কতগুলি খুলি, হাড়গোড়, শবের উপর শকুনি বসিয়া। কাকে চিলে শবের চোখ ঠোকরায়, নাড়িভুঁড়ি টানিয়া বাহির করে।

পরাশরের মনে প্রশ্ন জাগে, সবই কি বাস্তুহারাদের হাড়গোড়, না আগেও এখানে

শ্মশান ছিল, লোকে শব সৎকার করিত ?

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। ধীরে-ধীরে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে চলিয়া আসিল।

নির্জন জায়গা। কোণে শ্যাওড়া ঝোপের পাশে ছেলে কোলে একটি নারী ঘুমাইয়া আছে। তার কোমরের নিচের দিকে রোদ, উপরের দিকটা ছায়া। অন্ধকার মুখের উপরই বেশি, মনে হয় কে যেন একটা কালির পোঁচ টানিয়া দিয়াছে।

পরাশরের পায়ের তলায় শুকনো পাতার মর্‌মর শব্দে শিশুটির ঘুম ভাঙিয়া যায়। সে মায়ের ডান স্তনটাকে কুলপি মালাইয়ের মতন ধরিয়া চুষিতে আরম্ভ করে। দুধ না-পাইয়া কাঁদে, মাথা দিয়া মায়ের বুকে ঢুঁ মারে, চ্যাঁচায়। মা সাড়া দেয় না। ছেলের কচি হাতের আঘাতে তার একখানা হাত বুকের উপর হইতে নিচে গড়াইয়া যায়। হাত-পা-মাথা কলের পুতুলের মতন কাঁপে।

পরাশর একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। দৃশ্যটা তার মনে দোলা দেয়। সে ভাবে, এই-যে কাতারে-কাতারে মানুষ মরণকে এড়াইবার জন্য ভিটাবাড়ি ছাড়িয়া অচিন দেশে চলিল, মৃত্যুকে তারা এড়াইতে পারিল কই ? বরং পথে-পথে নূতন শ্মশানের সৃষ্টি করিল।

শিশুটি পরাশরের দিকে কচি দুখানা হাত বাড়াইয়া দেয়, হাত-পা বাড়াইয়া যেন কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়।

পরাশর আর থাকিতে পারে না, তাকে কোলে তুলিয়া নেয়। শিশুটি সঙ্গে-সঙ্গেই চুপ করে।

তাকে কোলে করিয়া সে অন্ধকারের মধ্যে ধীরে-ধীরে ঘোরে। ভাবে শিশুটির মায়ের কথা। আহা, বেচারি ওখানে একা পড়িয়া আছে। পুবের ঐ মাঠই তো ওর যোগ্য স্থান। সেখানে আর পাঁচটা শবের সঙ্গে তাকে রাখিতে পারিলে কী-ভালোই না হইত !

অন্তত পরাশরের আত্মা তাহাতে তৃপ্তি পাইত সন্দেহ নাই।

এই সময় বৈষ্ণবী আসিয়া বলিল, 'তাড়াতাড়ি চলেন, আমাগো আস্তানা গুটাইতে হবে।'

'কেন ? এত রাত্তিরে'—বলিয়াই পরাশর অদূরে বাস্তুহারাদের দিকে তাকায়। তাদের মধ্যে দ্যাখে একটা ত্রস্ত চাঞ্চল্য। তারা শলা-পরামর্শ করে, গুজুর-গুজুর করে, গাঁটরি-বোঁচকা বাঁধে। মনে হয় এখনই রওনা হইবে।

বৈষ্ণবী বলিল, 'দুইজন লোক শুইনা আইছে, বেশি রাত্রে মুসলমানেরা এখানে চড়াও হবে।'

পরাশর বলিল, 'ওঃ !'

বৈষ্ণবীর পিছু-পিছু সে স্ত্রী-পুত্রের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মোহিনী জিনিস গুছাইতেছিল। পাশে যাদব শুইয়া। সে বাপের দিকে মিটমিট করিয়া তাকাইল। তার চাহনি প্রশ্ন করিতেছিল, তোমার কোলে কে ও ?

মোহিনী যেন রাগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। একটু পরে সে বলিল, 'ফালাইয়া দেও ওটারে। অর মা কলোরেতে মরছে, সর্বাঙ্গে অর বিষ।'

পরাশর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

মোহিনী বলিল, 'নিজের ছাওয়ালেরে পথের কাঁটা কইয়া গাল দিছ। এদিকে কুড়াইয়া আনছ আরেকটা বিষ-কাঁটা।'

'কাঁটাই ত, একশো বার কাঁটা'—পরাশর কথাটা জোর দিয়া বলার চেষ্টা করে বটে কিন্তু গলার পর্দা নামিয়া যায়। নিজের কাজের সমর্থন পাওয়ার জন্য সে বৈষ্ণবীর দিকে তাকায়। বৈষ্ণবীও কোনো কথা বলে না।

পরাশরের রাগ হয়, মনে হয়, কী-বিচিত্র এই মানুষের মন! পরশু দিন পর্যন্ত এখানে অনেক লোক ছিল, কলেরার রোগীই ছিল কয়েকটি। সবাই ঠাশাঠাশি ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বাস করিয়াছে।

আজ মানুষ কম, রোগী মোটেই নাই, আছে শুধু শেষ রোগিণীর স্মৃতিচিহ্ন, তার বুকের মাংসের এই দলাটুকু। সেটুকুকে এরা ভয় করে, দূর-দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে চায়!

মোহিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। এবার বলিল, 'বেশ, অরে লইয়াই থাকো।'

পরাশর নীরব।

একটু পরে মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি শোনো নাই কিছু?'

'শুনছি ত, কিন্তু এত রাত্তিরে অন্ধকারের মধ্যে—'

মোহিনী বাধা দিয়া বলিল, 'আর-সবাই গেলে আমরাই বা থাকুম কী কইরা?'

পরাশর বলিল, 'তাও ত ঠিক।'

সন্ধ্যার আগে দুইজন বাস্তুহারা দক্ষিণের মাঠে বেড়াইতে যাইয়া শুনিয়া আসিয়াছে যে মুসলমানেরা আজ গভীর রাত্রে দিঘির পারে চড়াও হইবে! বয়স্কদের জেরায় তারা পরস্পরবিরোধী কথা বলে বটে, কিন্তু বাস্তুহারারা সিদ্ধান্ত করিয়াছে, এখনই এ জায়গা ছাড়িয়া যাইবে।

স্ত্রীর কাছে সব শুনিয়া পরাশর একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনারা চললেন কোথায়?'

লোকটি উত্তর করিল, 'ভগবান যেখানে নেন। কেন, আপনি যাবেন না?'

'যাবো ত। কিন্তু এই আঁধারে, অচেনা পথে কোন ভরসায় যাবো?'

'থাকবেনই বা কীসের ভরসায়? বরং কিছু দূরে গেলে গ্রাম পাইতে পারি, হিন্দুর গাঁ।'

পরাশর বলিল, 'গাঁ-টা যদি মোছলমানের হয়?'

'দয়ালু মোছলমান থাকলে তাঁরা আমাগো বাঁচাবেন। সবাই ত আর কাঠ মোল্লা না।'

'কিন্তু এখানে যে ঝালেমা হইবো তারই বা বিশ্বাস কী?'

'আমাগো নিজের লোক শুইনা আইছে, বামুনের পায়ে হাত দিয়া তারা কইছে।'

পরাশর বলিল, 'ওঃ।'

প্রায় সবাই তখন তৈরি। বাকি শুধু পরাশরের মালপত্র গোছানো। মোহিনী সব বাঁধিয়া লইতে পারে নাই। পরাশর শিশুটিকে মাটিতে রাখিয়া গাঁটরি-বোঁচকা বাঁধিতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে শিশুটি কান্না জুড়িয়া দিল।

মোহিনী বলে, 'কী-উৎপাতই না জোটাইছো।'

পরাশর কোনো উত্তর করে না। পাশের লোকটি বলে, 'একটু তাড়াতাড়ি করেন, মশায়।'

মিনিট খানেক যাইতে-না-যাইতেই অপর-একজন বলিল, 'আপনার জন্য সবাই শেষটায় এইখানেই মরুম দেখতাছি। তাছাড়া জোটাইছেন একটা জ্যান্ত বিষ।'

পরাশরের ভারি রাগ হয়।

এই সময় মোহিনী বলিল, 'মালের বোঝার উপর আমি আর বোঝা বাড়াইতে পারুম না কিন্তু।'

যাত্রা শুরু হয়।

পরাশর কাঁধের উপর তোরঙ্গ তুলিয়া নেয়, পিঠে বোঁচকা। এককোলে নেয় যাদবকে আরেক কোলে শিশুটিকে।

ছোটো-ছোটো দশ-বারোটি দল অন্ধকার ভেদ করিয়া চলে। পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে আলো জ্বালে না। তারা নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা বলে না, পা ফ্যালে আলতোভাবে।

পরাশরের বোঝা বেশি, তাই তার চলিতে কষ্ট হয়। সে পিছাইয়া পড়ে। সামনের লোকেরা ডাকে, 'পা চালাইয়া আসেন, মশায়।'

তাদের সঙ্গে দূরত্ব যতই বাড়ে, এই তাগিদও ততই কমিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আর শোনা যায় না।

বৈষ্ণবীও আগের লোকদের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। পরাশররা মাত্র চারজন, তারা স্বামী-স্ত্রী, যাদব ও নূতন শিশুটি।

পরাশর বরাবরই চুপ করিয়াছিল। সে শুধু একবার বলিল, 'এমন রাধাবল্লভের জীবটাও চইলা গেল। এরই নাম বরাত।'

মাঝে-মাঝে বাজ-চিল-শকুনি ডানা ঝাপটা দেয়, হুতুম প্যাঁচা ডাকে, শিয়াল হুক্কা-হুয়া করিয়া ওঠে। মোহিনীর মনে হয় এই সমস্ত অলক্ষণ কুলক্ষণের কারণ নূতন পথের কাঁটা মা-বাপ হারা ঐ ছেলেটা। শক্তি থাকিলে সে হয়তো তাকে দিঘির পুবদিকের মাঠে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত।

দূরে শব্দ হয়, অস্পষ্ট শব্দ—অনেকটা আল্লাহোর মতন।

মোহিনী বলে, 'ঐ ঐ—'

পরাশর ধমক দেয়, 'অত ভয় কীসের? যা হবার তা হবে।'

'হওয়ার আর বাকি রাখছো নাকি কিছু? পথের ঐ কাঁটা জোটাইয়া এখন—'

পরাশর গর্জন করিয়া উঠিল, 'বেশি ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিস ত বেবাক কটারে ফালাইয়া একদিকে ছুটিয়া যাবো—তোরে, যাদবরে, এই হারামজাদারে। পথের কাঁটা আর একটাও রাখুম না।'

মোহিনী ভয়ে-ভয়ে চুপ করে। তার স্বামীর পক্ষে আজ তাদের এখানে ফেলিয়া যাওয়া এমন-কিছু বিচিত্র নয়, যেমন বিচিত্র নয় ঐ হতভাগাটাকে কুড়াইয়া আনা।

সে যাদবকে ছুঁইয়া নীরবে স্বামীর পাশে-পাশে চলিতে থাকে।

কুলপতি

দিনেশচন্দ্র রায়

আমি এ বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসেছি। আমার বিয়ের মাত্র এক বছর আগে আমার শাশুড়ি মারা গেছেন। বৌভাতের পরের দিনই দেখলাম সারাটা বাড়ি যেন আমার হাতে সব ভার তুলে দিতে, সব ব্যাপারে আমার আদেশ নিতে জো-হুজুর হয়ে আছে। আমাকে ঘিরে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা, নানা নালিশ-সুপারিশ, অভিযোগ-আবেদন। আমি তখনও এ-বাড়ির সব ক-খানা ঘর পর্যন্ত দেখিনি। বাড়ির চারপাশটাতে চোখ বোলাতে পারিনি। রাতে শুয়ে শুয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি গো, এতবড় বাড়ির সবকিছু কি আমাকে দেখতে হবে?' আমার বর দুষ্টু-দুষ্টু হেসে চুপ করে রইল। ফলে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে আরো রহস্যময় হয়ে উঠল। দু-দিন পরে আমরা দ্বিরাগমনে গেলাম। ভাবলাম, আগে ঘুরে আসি, তারপর সব কিছু দেখা যাবে।

ফিরে আসবার দু-তিনদিন পরেই একদিন শ্বশুরমশায় আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার শ্বশুর খুব রাশভারি লোক। খুব লম্বা। ফুটফুটে রং। টাকমাথা। এখনও হাঁটলে মাটি কাঁপে। দুরদুর বুকে ঘরে গিয়ে দেখি শ্বশুর চুপচাপ বিছানাতে বসে আছেন। বসে বসে ঘুমোচ্ছেন না জেগে আছেন বুঝতে পারলাম না। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতেই শ্বশুর চোখ খুলে একটু মিষ্টি হাসলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তোমার শরীর ভালো আছে তো? বাড়ির জন্য মন কেমন করছে? এটাই তোমার বাড়িঘর মা, সব দেখেশুনে নাও।' উনি চুপ করলেন, পৈতেটাকে দু হাতে টানটান করে পিঠ চুলকে নিলেন, তারপর আবার কথা বলা শুরু করলেন, 'মন্দিরে আমাদের কুলবিগ্রহ কালাচাঁদ খুব জাগ্রত দেবতা। তাঁর মহিমার শেষ নেই। প্রায় চারপুরুষ ধরে আমরা এই কুলদেবতার সেবায়েত। এই ঘরবাড়ি, বিষয়সম্পত্তি, খানাদানা, পাইক-বরকন্দাজ সব কালাচাঁদের। তাঁর সেবক হিসাবে আমরা ভোগ দখল করি মাত্র।' শ্বশুর আবার তাঁর ডানহাতের তর্জনী দিয়ে কানটা চুলকে নিলেন, 'তোমার শাশুড়ি গত একবছর গত হয়েছেন, তুমি আমার মালক্ষ্মী, তুমি নিজে দেখবে কালাচাঁদের ভোগরাগে, সেবা-আরাধনাতে কোনো ত্রুটি না হয়। তাহলে আমাদের সর্বনাশ হবে। এ বাড়িতে তুমি নতুন বউ, তোমার হাতেই সংসারের ভার, তাই আগামীকাল সকালে তোমাকে কালাচাঁদের সামনে বরণ করা হবে। তুমি আগামীকালের ভোগ নিজে হাতে রাঁধবে। এটাই এ-বাড়ির রীতি!'

পরদিন সকালে দাসী এসে আমার চুল বেঁধে দিল। বেনারশি পরে, সারা গায়ে অলঙ্কার ঝলমলিয়ে মন্দিরে গেলাম। আমি আর আমার স্বামী পাশাপাশি জোড়াসনে বিগ্রহের দিকে মুখ করে বসলাম। এক দীর্ঘ অনুষ্ঠানের পর, কালাচাঁদের সেবিকা হিসেবে আমাকে বরণ করা হল, না. আমাকে আর একবার বিয়ে দেওয়া হল—এটা বুঝতে পারলাম না। তবে এটা বুঝলাম আমার অস্তিত্ব আমার স্বামী আর কালাচাঁদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে